Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার লোকক্রীড়ায় বাদ্য

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা)
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.9
Pages	195-202
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলার লোকক্রীড়ায় বাদ্য

Check for updates

মোঃ জিয়াউর রহমান*

খেলাধুলার সঙ্গে শরীর গঠনের সম্পর্ক রয়েছে এবং সংগীতের সাথে মনঃগঠনের সম্পর্ক রয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে মন সতেজ হলে তার কাছে সংগীত আরো প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। সংগীত নৃত্যের সাথে বা অঙ্গ সঞ্চালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ফলে সংগীতও এক অর্থে শরীর গঠনে সহায়ক। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ক্রীড়ার আড়ালে রয়েছে মানুষের যাপিত জীবনের নানামাত্রিক প্রভাব। 'এক একটি লোকক্রীড়া হলো জীবনের স্বপ্ন আর সম্ভাবনার সমন্বয়। এর বহিরঙ্গে আছে ক্রীড়াশৈলীর অবয়ব কিন্তু অন্তরালে আছে বিবর্তিত সময়ের স্বাক্ষর।' প্রাচীন রণবাদ্য যেমন জয়ঢাক, রণভেরি, মহানাকাড়া, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাজানো সহজসাধ্য কাজ নয়; এর জন্য শারীরিকভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে, দক্ষতার অর্জনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য রাখতে হয় এবং কসরত করে বাদনশৈলী উপস্থাপন করতে হয়। বাদনের দক্ষতা ও কৌশলকে একধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাদন বা পরিবেশনের জন্য যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, তা সঞ্চয়ের জন্য নিয়মিত কঠোর ব্যায়াম ও শারীরিক কসরত করে আত্মিক ও মানসিক সাবলম্বিতা অর্জন করতে হয়। প্রাচীন কালের সংগীতরীতিতে তাই সংগীতকলার সাথে কর্মযোগকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ক্রীড়া দৃঢ়তা আনে, জয়ের গৌরব বিজয়ীকে সংবেদনশীল করে। পরাজয়ের গ্লানি বিজিতকে ধৈর্যশীল ও সাহসী, সহিষ্ণু ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে এবং মননশীলতার বিকাশ ঘটায়। একারণে নিত্য আবশ্যকীয় শিক্ষায় সংগীতচর্চার সাথে শরীরচর্চাকেও অপরিহার্য করা হয়েছে। সংগীতশাস্ত্র অন্বেষণ করলেও শরীরবিদ্যার নানা অধ্যায় পাওয়া যায়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সৃষ্ট যোগ-সাধনায় সংগীত অপরিহার্য।

আদিম যুগের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে, ক্রীড়া ও সংগীত উভয়ই এক সাথে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তা উভয়ের সাথে গলাগলি ধরে বিকশিত হয়েছে। পর্বত, সমতল ও অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের শিকার করার জন্য শারীরিকভাবে দক্ষ ও বলিষ্ঠ শক্তির অধিকারী হতে হতো। একারণে তারা শক্তিচর্চার জন্য নানাবিধ ক্রীড়া-কসরত যেমন দৌড়ঝাঁপ, লাফ, তীর-ধনুক চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, পাথর নিক্ষেপ, ধনুক বাঁকানো প্রভৃতি অনুশীলন করত এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। আদিম যাযাবর মানুষকে হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা ভিন্ন গোত্রের আধিপত্য রোধে শিকার কৌশলের পাশাপাশি সমর কৌশলও শিখতে হতো। বাংলার অসংখ্য লোকক্রীড়ায় আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক কৌশলের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা সেই আদিম যুগের প্রবাহিত সমর কৌশলেরই উত্তরাধিকার। লোকক্রীড়ার উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন—

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> হিংস্র শ্বাপদসমাকীর্ণ পর্বতারণ্যের যাযাবরীয় জীবনের প্রতি পদক্ষেপ বিপদসংকুল হওয়ায় একদা শারীরিক শক্তির চর্চা ব্যতীত জীবন সংগ্রামে জয়লাভের অন্য কোন উপায় ছিল না। তাই পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন যে প্রধানত আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষকে দৌড়, লাফ, তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ, শিকার প্রভৃতির কলাকৌশল শিখে নিতে হয়েছিল। উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও ছিল। [শঙ্কর, ১৯৭৬ : ১১]

শিকারের সময় আদিম মানুষেরা বন্যপ্রাণীর বেশ-ভূষণ পরিধান করত এবং মহিষ, হরিণ, বাঘ বা অন্যান্য প্রাণীর বেশ ধরে মুখোশ পরে জন্তুদের দলে ঢুকে পড়ত। শিকার শেষে কিংবা ভক্ষণের পর তারা ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধতা প্রকাশের জন্য বন্য পশুর চামড়া, মাথার খুলি পরিধান করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নাচানাচি করত এবং বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় উদ্দীপিত হতো। শিকার করার অস্ত্র যেমন পাথর, তীর, লাঠি, বর্শা, প্রাণীর মাথার খুলি ইত্যাদি দিয়ে তাল-ছন্দ তুলত। কার্ল বডমার-এর আঁকা আদিম যুগের ভারতবাসীদের মহিষের মুখোশ পরা দলবদ্ধ ক্রীড়ার দৃশ্য সেই সময়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। [চিত্র-১]

কার্ল বডমার-এর আঁকা আদিম যুগের ভারতবাসীদের মহিষের মুখোশ পরা দলবদ্ধ ক্রীড়া

এই সমস্ত ক্রীড়া-প্রদর্শনকে অনেকেই নৃত্য বলে থাকেন। ইতিহাসবেত্তাগণ এই পরিবেশনাকে নৃত্য বলেছেন অঙ্গভঙ্গির শৃঙ্খলা ও বৃত্তাকারে পদক্ষেপের বিষয়টি কল্পনা করে। হয়তো আধুনিক ক্রীড়ার মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা বা কৌশল অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংযুক্তি রয়েছে, আদিম ক্রীড়া সেই পর্যায়ে ছিল না বলেই প্রতিযোগিতাহীন শারীরিক ভঙ্গিকে ক্রীড়া বলা হয় নি। কিন্তু সেই দলবদ্ধ পরিবেশনাকে সংগীত, নৃত্য ও ক্রীড়া প্রতিটির উৎস বললেও ভুল হবে না। একইভাবে শিকারের কালে তাদের ব্যবহৃত বর্শা,

বল্লম, টোটা, ফলা, শুকনো চামড়া, খুলি ও কঙ্কালের মুকুট, পাথর, কাঠ, হরিণ-মহিষের শিং, হাড় প্রভৃতি বাদ্য নির্মাণের প্রাথমিক উপাদান বলে আধুনিক সংগীতবেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন। কণ্ঠের চিৎকার বা আহ্বান ধ্বনিকে আধুনিক ভাষাবিদগণ ভাষা ও সংগীতের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তীর, বল্লম, চাকতি, পাথর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নানা আসরে আর্চারি বা স্যুটিং নামে আধুনিক পরিচয় লাভ করেছে। অন্য গোত্রকে পরাস্ত করার জন্য তারা যে সমর কৌশল শিখেছিল, এখন তা ধীরে ধীরে বিশ্বমানের বুদ্ধির খেলা দাবা বা নওবল খেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদেও নওবলের উল্লেখ আছে। তাহলো —

করুণা পীঢ়িহি খেলহুঁ নঅবল[১]।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
[কৃষ্ণপাদানাম, চর্যা-১২, রাগ : ভৈরবী]

অর্থাৎ এই পদে কৃষ্ণপদকর্তা বলছেন —

করুণা-ছকে খেলি দাবার বল
সদ্‌গুরু-বোধে জিতিলাম ভববল॥
(Shahidullah, 1966 : 38)

সাধকের জীবন শুধু ত্যাগ কিংবা নিবেদনমুখীই নয়, তাকে সিদ্ধি লাভ করতে হলে 'নঅ-বল' বা দাবা খেলার মতো দক্ষতা অর্জন করতে হয়, বিচক্ষণ-বিজয়ীও হতে হয়। অর্থাৎ খেলাধুলা তা শারীরিক হোক আর বুদ্ধির হোক, মানুষের মনকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে থাকে সবসময়।

প্রাচীন যুগের মানুষ প্রাণী শিকারের পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে খাদ্য সংস্থানের জন্য ফসল আবাদ করতে শিখেছিল এবং পরিবার-গোত্রকে সমাজে রূপান্তরিত করেছিল। 'অরণ্যচারী শিকারি জীবন থেকে এদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার উত্তরণ ঘটে অস্ট্রিকদের কালে। ... বুনো ধানকে গার্হস্থ্যকরণ করে নিয়ে পাহাড়ের গা কেটে আর সমতল ভূমিতে তা চাষ করত।' [শাহরিয়ার, ২০১০ : ৫] তাদের কর্ম ও শ্রমের সুবিধার জন্য তখন অনেক বন্যজন্তুকে বশে এনে তারা গৃহপালন করতে শিখল। গরু-মোষ-বানর-ভল্লুক-ঘোড়া-কুকুর-বিড়াল-ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীকে মানুষেরা নানাভাবে ব্যবহার করতে থাকল। যেমন, ঘোড়াকে সমর ও ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে, বিড়ালকে অন্যান্য ছোট প্রাণীর উৎপাতরোধে, কুকুরকে গৃহ-পাহারায়, ঘোড়া গরু মোষকে কৃষিকাজ ও যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো হলো। পরবর্তীকালে প্রাণীদের আরো সূক্ষ্ম কাজে ব্যবহার করতে দেখা গেল। পাশাপাশি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন, ঘোড়ার লেজ দিয়ে বেহালার ছড় বানানো, বানরের চামড়া দিয়ে 'ডুগডুগি' বানিয়ে আবার সেই বানরকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে মনোরঞ্জন ও অর্থোপার্জন, গরুর চামড়া দিয়ে 'ঢাক', 'ঢোল', 'খোল', 'মৃদঙ্গ' বানানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গাছ কেটে ঘর বানানোর পাশাপাশি কাঠের টুকরো দিয়ে 'করতাল', 'খোল', 'ঢোল', ঢাকের চাক তৈরি করা, বাঁশ দিয়ে 'বাঁশি' এই সব অভিনব বাদ্য সৃষ্টি করে সভ্যতার বিকাশ

ঘটানো হলো। প্রকৃতি, বৃক্ষ ও প্রাণী এই তিনের সমন্বয় তাদের শিল্পভাবনাকে তাড়িত করেছিল। অর্থাৎ শ্রমের সাথে সংগীতের সম্পর্ক আদ্যন্ত। বাদ্য সব সময় তার অনুগামী ছিল। শ্রমের সাথে ক্রীড়া যুক্ত না হলে অবসাদ নেমে আসে, তখন সংগীত নিজেই ক্রীড়ার ভূমিকা গ্রহণ করে। 'বৈঠা বন্ধ হলে সারি গান বন্ধ হয়। সারি এবং ভাটিয়ালি নৌ-চলাচলের সাথে যুক্ত হলেও, এদের তাল ভিন্ন।' [শক্তিনাথ, ২০০৩ : ১]

আধুনিক জীবনে সংগীত ও ক্রীড়া যে উচ্চতায় উৎকর্ষ লাভ করেছে, আদিমকাল বা তার পরবর্তীকালের সাথে এর তুলনা করা অবান্তর। কিন্তু আধুনিক ক্রীড়া ও সংগীতের কাঠামোগত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালের মৌলিকত্বকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে নি। প্রাচীনকালের সমাজ কৌমভিত্তিক ছিল বলে প্রত্যেকে ক্রীড়া ও সংগীতের সাথে ঘনিষ্ঠ ও অনিবার্যভাবে যুক্ত ছিল।[২] ফলে শিল্পমাধ্যমগুলো আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত হলেও এদের পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে গেছে। ক্রীড়ার সাথে সংগীতের সেই সম্পর্ক অকৃত্রিম। বাংলার লোকক্রীড়ার শ্রেণিগত বিভাজন অশেষ। তন্মধ্যে কিছু কিছু ক্রীড়া সরাসরি সংগীতকে প্রতিনিধিত্ব করে।

লোকক্রীড়াকে মোটা দাগে শ্রেণিবিভক্ত করলে দেখা যায়, জলের খেলা, স্থলের খেলা, শিশুদের খেলা, বুদ্ধির খেলা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের খেলা, আতশবাজির খেলা, অস্ত্র ও শক্তির খেলা, ঘুড়ি খেলা, ধাঁধা খেলা, কৌশল ও চাতুরির খেলা, নাট্যধর্মী বা সংগীতধর্মী খেলা, ঘরকন্নার খেলা, প্রশ্নোত্তর বা জিজ্ঞাসার খেলা প্রভৃতি আঙ্গিকের অসংখ্য খেলা প্রচলিত ছিল বা আছে। তবে কিছু খেলা আছে সংগীতনির্ভর আবার কিছু সংগীত আছে ক্রীড়ানির্ভর। ময়মনসিংহের জারিগান, যশোরের কবিগানের পালা, বিচারগান, তরজাগান এরকম অসংখ্য সংগীতাঙ্গিকে রয়েছে ক্রীড়াসম্পৃক্তি ও লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি। এই সমস্ত সংগীতে দেশি লোকবাদ্য রয়েছে যেমন 'মন্দিরা', 'কাঁসি', 'ঢোল', 'করতাল', 'খমক', 'বেনু', 'বেনা', 'ডুগডুগি', 'চটি', 'পাইল্যা', 'শিঙ্গা' ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ পরিবেশনায় ঢোল, করতাল, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, দোতারা ইত্যাদি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ক্রীড়ায় জয়-পরাজয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ই থাকে। প্রাচীনকালের কোনো বাস্তব ঘটনা বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক কালে এসে তা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছুকাল আগেও রাজ্য দখলের জন্য বা শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য বীরযোদ্ধা তেজী ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে যেত। সেই গর্বিত ইতিহাস এখন চট্টগ্রামে 'চৌগান' খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। রোসঙ্গ রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের কবিতায় ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতার সেই বর্ণনা এসেছে :

চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ
দুইদিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল
মধ্যভাগে আরোপিয়া গেরুয়া ফেলিল।
[শরীফ, ১৯৭৭ : ৩০৯]

তবে প্রাচীনকালে যে ঘটনাটি জয়-পরাজয়ের লড়াই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরবর্তীকালের খেলাধুলায় তা প্রতিযোগিতামূলক হলেও সম্প্রীতির আবাহন হিসেবে বাংলার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ

করেছে। যেমন গোল্লাছুট খেলার অন্তরালে সামন্তকালের দাস জীবনের করুণ স্মৃতিই তাড়িত করে থাকে। কলুর ঘানির মতো বন্দি গোল্লাছুটের একেকজন গোল্লা যেন পাহারাদারের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে, যদি কেউ ধরা পড়ে যায় তখন তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। বউচি খেলার মধ্যে কন্যা অপহরণ বা ক্ষমতাশালীদের ইচ্ছানুযায়ী নারী দখলের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। হাডু-ডু খেলায় ভূমি-চর দখলজনিত সংগ্রামের প্রতিফলন রয়ে গেছে। নৌকা-বাইচের মতো অতি জনপ্রিয় এই খেলাটি মূলত নদীমাতৃক দেশের নৌবাহিনীর দক্ষতা ও অনুশীলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে যুদ্ধ কিংবা জমি দখলের জন্য ক্ষিপ্র দস্যুদলের নদীযাত্রার ইতিহাসকেও মূর্ত করে তোলে।

ষোলঘুটি খেলা বা বাঘবন্দি খেলাকে এখন হয়ত আত্মরক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে না দেখে বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ রূপে দেখা হয়। একইভাবে কবিগানে, তরজাগানে দু-পক্ষের তর্ক-বিতর্ক অতীতকালের জমিদারদের আদালত ও বিচারকার্যের কথা ভাবিয়ে তোলে। সেকালে হয়ত দু-পক্ষের কোনোজন ক্ষমতা বা লোকবলে সেরা থাকলেও যুক্তিতর্কে হেরে দুর্বলকে রাজ্যদান করতে হতো। এখন দুই কবির লড়াইয়ে হারজিতের থেকেও কবিদের তাৎক্ষণিক বিচক্ষণতা ও বিচারশক্তিকে মুখ্য করে দেখা হয়। বাদ্যযন্ত্র এখানে দুই কবির মুখোমুখি সংঘর্ষকে আরো তীব্রতা দান করে এবং ক্রীড়ামত্ততা তৈরি করে। কথার উপর পাল্টা কথা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হয়, সুরের পাল্টা সুর, তালের পাল্টা তাল দিয়ে পরিস্থিতিকে আরো সংঘর্ষময় করে তোলা হয়। কবিগানে ঢোল, কাঁসি, বাঁশি, করনেট, করতাল লড়াইকে উস্‌কে দিতেই যেন সচেষ্ট থাকে। এটি বাদ্যকারদের অনুপম ক্রীড়াশৈলী, যাকে সংগীতের ভাষায় সওয়াল-জওয়াব বলে অভিহিত করা হয়। খেয়াল গানে ও শাস্ত্রীয় সংগীতের যৌথবাদনেও এই ক্রীড়ামত্ততা বেশ উপভোগ্য।

গ্রামীণ জীবনের যে সব লোকক্রীড়ায় বাদ্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তন্মধ্যে লাঠি-শরকি খেলা, নৌকা-বাইচ, সাপখেলা, বানর খেলা, পাতাখেলা, ঘুড়ি কাটা, ঘোড়াঘুড়ি, হাডুডু প্রতিযোগিতা অন্যতম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রীড়াকে উদ্দীপিত করতে বাদ্য ব্যবহৃত হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাদ্যকেই খেলার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলায় বাদ্য ছাড়া সংঘবদ্ধ লাঠি চালনা করা সম্ভব নয়। তালছন্দ রক্ষার জন্য লাঠিখেলায় যে বোল-তাল বাজানো হয় তা-ও সাংগীতিক বোল বাণী থেকে ভিন্ন, যেমন রায়বেঁশে লাঠিখেলায় ঢোলের বোল :

ঘিউর গিজ্জা ঘিউর গিজ্জা —
(উরর) ঘিনিতা ঘিনিতা ঘিউর তা তা তা (ইয়া)
(উরর) জাঘিন জাঘিন জাঘিন ঝা — তা তাতা তাতাক তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা — তিলিতা তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা — তিলিতা তিলিতা তা তা
(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি —

সংগীত নৃত্য ও ক্রীড়া একই শৃঙ্খলায় যে আবদ্ধ তার প্রমাণ পাওয়া যায় লাঠিখেলা বিষয়ক আরেকটি ছড়ায়।

আয় বিভেদ ভুলি, সবে খেলি মিশে
আয় বিভেদ ভুলি, সবে নাচি মিশে
ও ব্ ব্ ব্ ব্ আঃ
ও ব্ ব্ ব্ ব্ আঃ
ও ব্ ব্ ব্ ব্ আঃ

এই বোলের কাঠামোর ভিতর দিয়ে লাঠি সঞ্চালন ও দেহ ভঙ্গিমার অপূর্ব কৌশল পরিলক্ষিত হয়, এবং তা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা কিংবা মল্লযুদ্ধের ছন্দ মেলানোর গুরুত্ব রাখে। রায়বেঁশে খেলায় লাঠিয়ালগণ লাঠি প্রদর্শনের পাশাপাশি মোটা বাঁশ, ঢেঁকি, গরুর গাড়ির চাকা প্রদর্শন করে। এসময় ঢোল, কাঁসি, ঢাক, ডগর, ডুগডুগি, কৃষ্ণবাঁশি, কাড়া, নাকাড়া, পাঁড়া, ছোট দুন্দুভি, ঝাঁজ-এর পাশাপাশি পায়ে নূপুর বা ঘুঙুর ব্যবহার করে থাকে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বলেছেন :

বাজন নূপুর পায় বীরঘণ্ট পাইকা ধায়
রায়বাঁশ্যা ধায় খরশান।
[মহুয়া, ১৯০২ : ৯]

অন্য অর্থে লাঠি নিজেই বাদ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, একটি লাঠির সাথে আরেকটি লাঠির আঘাতে যে ছন্দোময় শব্দ তৈরি হয়, তা সাংগীতিক ক্রীড়ানৈপুণ্যেরই স্মারক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া ঢোল-ঢাকে, কাড়া-নাকাড়ায় লাঠি ও কাঠি অনিবার্য অনুষঙ্গ। নৌকা-বাইচে দলকে উদ্দীপিত করতে স্বাধীন মতো ঢাক ঢোল কাসি কাড়া নাকারা জাতীয় উচ্চনিনাদি বাদ্য বাজাতে দেখা যায়। সাপখেলায় সাপুড়ে বীণ বাজিয়ে সাপকে বশীভূত করে এবং সাপুড়ের ইচ্ছাধীনে সাপ ফণা তুলে থাকে। উত্তরবঙ্গের পাতাখেলায় যে জাদুবিশ্বাসের ছাপ পাওয়া যায় সেখানে গুণীন মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে অন্যের পাতাকে তার দিকে টেনে আনতে থাকে, তখন ঢোল-কাঁসির বাজনা পরিস্থিতিকে আরো উদ্বিগ্ন করে তোলে। আদিবাসীদের এমন কিছু বাদ্য রয়েছে যা শুধু বাজানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিপুণ দক্ষতা প্রদর্শনের কথাও মনে করিয়ে দেয়। গারোদের ওয়াঙগালা উৎসবে দামা বাদন। ঘুড়ি ওড়ানোর ক্ষেত্রে শৌখিনভাবে অনেকে কোয়াড়ে-ঢাউস ইত্যাদি ঘুড়ির মাথায় বাঁশের বাতা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বেতের মসৃণ টানা দিয়ে থাকে। বাতাসে বেতের চল্টা কম্পিত হয়ে সুললিত ধ্বনি উৎপন্ন করে এবং মহল্লা জুড়ে সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। ভল্লুক ও বানর নাচনে ডুগডুগি বাজিয়ে আসর জমজমাট করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জানান দিতে পাড়ায় পাড়ায় ঢোল পেটানো হতো। ঢোলই ছিল পূর্বকালে মাইকের ন্যায় প্রচার বাহন। শিশুদের খেলার উপকরণ হিসেবে ঝুমঝুমি, ঘুঙুর, তালপাতার বাঁশি, আম আটির ভেঁপু, নলখাগড়া ও কাশের বেণু, মুখাবাঁশি, টেপাবাঁশি, মাটির একতারের বেহালা, চটকা এবং গিলার শুকনো ফল, টেমটেমি, টমটমি গাড়ি, ঝিঁঝিবাঁশি, মাটির পাখি এমন অসংখ্য খেলনাবাদ্য বাংলার লোকমেলায় শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের বস্তু ছিল। সম্প্রতি তার অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে। আজকের শিশুরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই আনন্দ-জগৎ সম্পর্কেও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

বাংলায় গীতিপ্রধান সংগীতের প্রসার থাকায় বাদ্যের বহুল ব্যবহারকে অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে খাটো করে দেখা হয়। শত-সহস্র গ্রামীণ খেলা ভুলে এখন বিদেশি বাণিজ্যনির্ভর খেলাধুলায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একইভাবে সাহিত্য ও ইতিহাসের তথ্যমতে, এদেশে বিপুল বাদ্য ছিল যা কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে, মানুষ এর ব্যবহার-কৌশল ভুলে গিয়েছে। বাদ্যকে খাটো করে দেখার পিছনে যেমন সামাজিক ও উগ্র ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, একইভাবে ছতর ঢাকার নামে খেলাধুলাকেই কোনো কোনো রক্ষণশীল গোষ্ঠী নিষিদ্ধের তালিকায় বন্দি করেছে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রাচুর্যকে শহুরে প্রমিত শিল্পের দুয়ারে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতবর্ণের ভেদ না রাখার ভূমিকায় লোকবাদ্য ও লোকক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শহুরেদের বিলাসিতার দুয়ারে কোনোটিই প্রকৃত সমাদর পায়নি। শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা সবই যেন প্রমিত শিল্পীদের করতলে। তাদের দাক্ষিণ্য পেলে গ্রামীণ শিল্প মূল্যায়ন পায়, নইলে তান্ত্রিক সাধুদের মতো গুহার গভীরে মুখ গুটিয়ে রাখে। গ্রামীণ শিল্পের বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের জন্য গ্রামীণ শিল্প মূল্যায়নের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল—সে সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বেশির ভাগ গবেষণায় বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান না থাকায় লোকশিল্পের অনেক রসদ শহুরে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে উর্বর ফসল ঘরে ওঠে নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই সঠিক মাত্রায় পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। লোকক্রীড়া বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যভুক্ত হওয়া এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি ছিল। ললিতকলা নামে যে পাঠক্রম রয়েছে সেখানে চারুপাঠ, শরীরগঠন, সংগীত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে শিশুর জ্ঞান ও চিত্ত বিকাশের জন্য সম্পূরক শরীর বিকাশের সমন্বয়হীনতা রয়েছে। অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে সংগীতের বদলে শরীরচর্চা করানো হয়, অথচ উভয়ই পাঠ্য হওয়া জরুরি ছিল। তা হয় নি বলে ইতিহাস পাঠ করা হলেও ইতিহাসের বাস্তবতা চেতনার আড়ালে থেকে গেছে। বাদ্যও সেই বঞ্চিতেরই দলে। গ্রামেগঞ্জে এত অসংখ্য ধরনের বাদ্য দেখা যেত, তা বাদ্য কি না, একথাটিই অনেকে অনুধাবন করেনি। উপরে আলোচিত শিশুদের খেলনাবাদ্য হারিয়ে গেছে বলেই আজ চিনা ও বিদেশি প্লাস্টিকের খেলনায় দেশ ছেয়ে গেছে। তবে এসবের ভিতরেও অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনাবাদ্য তৈরি হয়, কিন্তু সেসব খেলনাবাদ্য এদেশে সচরাচর আসে না। সংগীতপ্রিয় দেশে শিশুদের ঝুমঝুমি, নারকেল পাতার বাঁশি, পেঁপের ডালের বাঁশি, কলাডগার ডুগডুগি এগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে বাণিজ্যিক খেলনার ভিড়ে। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুর সৃজনশীল আনন্দসঙ্গী যতদিন অবাণিজ্যিক ছিল, ততদিনই তাদের সহজাত আনন্দ ছিল ঘরে ঘরে, মেলা-উৎসবে। নিগ্রোবটু, ভুডো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়দের শিল্পদক্ষতার অপমৃত্যু হয়েছিল পরবর্তীকালের নানা জাতির ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে। এখনো তার ব্যতিক্রম নয়, আপাত প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী বাজার দখল করে আছে, বাংলার নিজস্ব খেলনা ও ক্রীড়াঙ্গিকতা অবলুপ্ত হয়ে পড়েছে। গৌরবময় অতীত থাকা সত্ত্বেও এজাতি স্বাস্থ্যহীন পরনির্ভর মেধাশক্তিহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, সাংগীতিক নৈপুণ্য ও ভাষা হারিয়ে ফেলে আত্মপ্রকৃতিহীন সুন্দরের অভিযাত্রায় নুয়ে পড়ছে। মেধাবিকলাঙ্গ শিশুসম্পদে ভারাক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ গুরুসদয় দত্ত সিসিল শার্পের সূত্র ধরে বলেছেন—

ভাষা ছাড়া আছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী, যেগুলি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি — এবং তারপর হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় খেলাধুলা এবং জাতীয় নৃত্য। এগুলির প্রত্যেকটির উপর আমাদের জাতির প্রত্যেক শিশুর একটা জন্মগত অধিকার বর্ত্তমান রয়েছে; এবং এই জন্মগত অধিকারের প্রয়োগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যেমন অন্যায় তেমনি অন্য দিকে অতি অমঙ্গলকর। [সৈকত, ১৯৯৪ : ১২৯]

আদিমযুগে সংস্কৃতি নামক শব্দের তাৎপর্য বিষয়ে ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে হাজার হাজার বছর ধরে এর বিকাশ ঘটেছে। তারপর সংস্কৃতির সেইসব উপাদান বিলুপ্ত হতে বসেছে। এ নিয়ে এই পণ্যসমাজের কোনো আগ্রহও নেই, তাহলে কি মানুষ আবার আদিম জীবনের পথ ধরল! যখন সভ্যতার উত্তরণ ঘটে নি, তখন বাদ্যের স্থাপত্যগুণগত ধারণা ছিল না। বর্তমানকালে বাদ্যের প্রযুক্তি এতটাই বিলুপ্তির পথে যে তা প্রাক-সভ্যতায় ফিরিয়ে নেবে। এই প্রত্যাশা কারুরই কাম্য নয়।

টীকা

১. নঅবল অর্থ দাবা, চতুরঙ্গ, দ্যুতক্রিয়া, বা নয়ং-বলায়মন্ত্রনয় রহস্যং চতুর্থানন্দ বলং। তবে নঅ-বল'কে দাবা জাতীয় খেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে পদকর্তা বিভিন্ন ঘুটি হিসেব-নিকেশ করে চাল দেয়। এখানে সদগুরুর সাথে চলতে হলে এবং বোধিচিত্ত অর্জন করতে হলে একই হিসেব-নিকেশের সাবধানতা অবলম্বন করার ইঙ্গিত রয়েছে।

২. আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুন্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যে সব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গি প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। [নীহাররঞ্জন, ১৪১১ : ৬৩৪]

গ্রন্থপঞ্জি

অনুপম হীরা মণ্ডল (২০১১)। *লোকক্রীড়ার অন্তর্পাঠ*, অবসর, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (১৯৭৭)। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (২০১২)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪১১)। *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মহুয়া মুখোপাধ্যায় (১৯০২)। *যুদ্ধ নৃত্য বাংলা*, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় নদীয়া, কোলকাতা।

মযহারুল ইসলাম (১৯৯৯)। *আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শক্তিনাথ ঝা (২০০৩)। *শ্রমসংগীত*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

শঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯৭৬)। *বাঙালীর খেলাধুলা*, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলকাতা।

শামসুল আলম সাঈদ (২০০৯)। *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

শাহরিয়ার হোসেন শাবিন (২০১০)। *বাংলাদেশের লোকজ খেলনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সাইম রানা (২০০৮)। *বাংলার বাদ্যযন্ত্র : শ্রেণীবিভাগ, গবেষণা পদ্ধতি ও দোতারা*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

সৈকত আসগর (১৯৯৪)। *গুরুসদয় দত্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Muhammad Shahidullah (1966). *Buddhist mystic songs*, Bengali Academy, Dacca.